শামের মুজাহিদদের ম্যাগাজিন আর-রিসালাহ (ইস্যু-৪) থেকে বাংলায় অনূদিত প্রবন্ধ

“প্রত্যেক বিখ্যাত মুজাহিদের পেছনে রয়েছে একজন নারী”

"প্রত্যেক বিখ্যাত মুজাহিদের পেছনে রয়েছে একজন নারী"

মহান শায়খ 'আবদুল্লাহ ’আযযাম (রহিমাহুল্লাহ) একবার বলেছিলেন যে, ইসলামের ইতিহাস লাল ও কালো দিয়ে রচিত হয়েছে: “আলেমদের কলমের কালি এবং শহীদদের রক্ত।” প্রকৃতপক্ষে, ইসলামী সাহিত্য ঐসব লোকদের ইতিহাস দিয়ে ভরপুর, যারা আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ দিয়ে, তাঁর (আল্লাহর) সাথে কৃত ওয়াদা পরিপূর্ণ করেছেন। ঐসকল নারী যারা ইসলামের গৌরবান্বিত ইতিহাসে অংশগ্রহণ করেছেন, তারাও ইসলামী বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো পরিপূর্ণ করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, বিখ্যাত 'আলেমা 'আয়েশা বিনতে আবু-বকর এবং উম্মে সালামাহ, কবিদের মধ্য থেকে হিন্দ ও আল-খানসি, আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারীদের মধ্য থেকে খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ ও আসমা বিনতে আবু-বকর, আর মুজাহিদাগণের মধ্য থেকে নুসাইবাহ বিনতে কা'ব, উম্মে হারাম বিনতে মিলহাহ এবং খাওলাহ বিনতে আল-আজওয়ার (আল্লাহ তাঁদের উপর রহমত বর্ষণ করুন), উল্লেখযোগ্য।

যাইহোক, মুসলিমজাতি মহানপুরুষদের এসকল মা, ফুফু, সহধর্মিণী, বোন ও কন্যাদের কৃতিত্বের প্রাপ্য অনুযায়ী তাদেরকে সাধারণত সেভাবে স্মরণ করে না। প্রকৃতপক্ষে, এই উম্মাহ তার ঐসকল নারীদেরকে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহকে ﷺ সাহায্যকারী, ন্যায়পরায়ণ, বিনয়ী ও সাহসী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় জীবন উৎসর্গকারী মুসলিম মা, স্ত্রী, বোন এবং কন্যাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তাই, আর-রিসালাহ মিডিয়া এমন একজন মুসলিমার উপর ছোট একটি প্রতিবেদনমূলক কাহিনী উপস্থাপন করতে পেরে গর্বিত যিনি শুধুমাত্র পূর্বের নেককার নারীদের আদর্শ অনুসরণে সংগ্রাম করেই যাননি, বরং তিনি সমসাময়িক মুসলিমাদের জন্য একজন আদর্শ মুসলিমা ।

"প্রত্যেক বিখ্যাত মুজাহিদের পেছনে রয়েছে একজন নারী"

আমাতুল্লাহ আল-মাসরিয়্যাহ হিজরী ১৪০৩ সালে (১৯৮৩ খ্রিঃ) মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একটি ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর বয়স যখন এক বা দুই বছর, তখন তাঁর পরিবার তাদের সন্তানদেরকে সাথে নিয়ে সম্মান ও মর্যাদার ভূমিতে (আফগানিস্তান) হিজরত করেন। তাঁর পিতা একজন মুজাহিদ এবং শায়খ আইমান আল-জাওয়াহিরীর একজন সাথী ছিলেন। আফগানিস্তানে মুজাহিদদের জন্য একটি রকেট নির্মাণকালে তিনি শহীদ হন। তাঁর ভাইও আফগান জিহাদ চলাকালীন আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করেন (আল্লাহ তাঁদের উভয়কে কবুল করুন)।

তিনি একটি বরকতময় পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন; যেখানে তিনি নেকপরায়ণ ব্যক্তিদের সাহচর্য লাভ করেছিলেন এবং তাঁর চারপাশজুড়ে ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শবান ব্যক্তিত্বরা, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যেদিন আল্লাহর আরশ ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন... সেই যুবক যে সর্বশক্তিমান ও মর্যাদাবান মহান আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতে বড় হয়... (বুখারী ও মুসলিম)।

১৪ বছর বয়সে একজন ইয়েমেনী আলেমের সাথে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়; আর, জিহাদের ময়দানে বাল্যকাল অতিবাহিত করার পর, আবারও আমাতুল্লাহ হিজরত করেন- এবার 'ইলম ও ইমানের ভূমি ইয়েমেনে হিজরত করেন। পবিত্র বিবাহের পরবর্তী ৭ বছর, আমাতুল্লাহ ইয়েমেনে তাঁর স্বামীর অভিভাবকত্ব ও আনুগত্যের অধীনে থেকে জ্ঞানচর্চা করেন; যাইহোক, শীঘ্রই এই দম্পতি আফগানিস্তানে ফিরে আসেন। সম্মান এবং জিহাদের ভূমি আফগানিস্তানে ফিরে আসার পর এবং ইসলামী জ্ঞানসাধনা ও অর্জিত জ্ঞানের আমল করে জীবন অতিবাহিত করার পর, মুজাহিদ

"প্রত্যেক বিখ্যাত মুজাহিদের পেছনে রয়েছে একজন নারী"

'আলেম ও আমাতুল্লাহর স্বামী দ্রুত শাহাদাত বরণ করেন। এভাবে তিনি একটি ড্রোন হামলার শিকার হন এবং তাঁর পূর্ববর্তী শহীদদের কাতারে শামিল হয়ে যান, আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন ও তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন।

"এবং বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে যুদ্ধ করেছে। আল্লাহর পথে তাঁদের যে দুর্দশা হয়েছিল, তাতে তাঁরা হেরেও যায়নি, দুর্বলও হয়নি কিংবা নতিও স্বীকার করেনি। আর আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের ভালবাসেন।"

{আল-ইমরান:১৪৬}

বিয়ের পর, আমাতুল্লাহ তার স্বামীর পাঁচ সন্তানের মা হন, যাদেরকে তিনি এক দশকেরও অধিক সময় ধরে জিহাদের ভূমিতে বিদ্যমান কঠোর ও রূক্ষ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বড় করে তোলেন। এটা সবারই জানা আছে যে, মরিচাবিহীন লোহা প্রস্তুত করতে গেলে একে হাপরের উত্তাপ ও দহন সহ্য করতে হয়, আর বছরের পর বছর পাথরের স্তূপের নিচে নিষ্পিষ্ট হওয়া ব্যতীত হীরা উৎপন্ন হয় না।

প্রকৃতপক্ষে, তিনি বিশ্বের ঐ সকল মুসলিম নারীদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত ও অনুসরণীয় আদর্শ যারা তাদের সন্তানের কল্যাণ কামনা করে এবং যারা তাদের সাফল্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে চায়। যেহেতু তিনি তাঁর রবের প্রতি আত্মসমর্পণে সুদৃঢ় ছিলেন, বাস্তবিকই তিনি তাঁর সন্তানদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগের মর্যাদা সম্পর্কে শিক্ষাদান করেছিলেন। এভাবেই তিনি তার সন্তানদেরকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, কেননা তিনি জানতেন যে... প্রত্যেক শিশুই ফিতরাতের (ইসলামী একত্ববাদ) উপর জন্ম নেয়, কেবলমাত্র তার পিতামাতাই তাকে ইহুদী, খ্রিষ্টান বা জরথুস্ত্রীয়তে পরিণত করে। (সহিহ মুসলিম)

"প্রত্যেক বিখ্যাত মুজাহিদের পেছনে রয়েছে একজন নারী"

কয়েক বছর বিধবা থাকার পর অবশেষে আমাতুল্লাহ পুনরায় বিবাহ করতে সম্মত হন। তারপর, তিনি শেষবারের মত আফগানিস্তান ত্যাগ করে মু'মিনদের ঘাঁটি ও কেন্দ্রস্থল, আশ-শামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁর স্বামীর উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে নিরাপত্তাজনিত কারণে তিনি তুর্কিতে অবস্থান নেন, সেখানে থাকাকালীন, তিনি খবর পান যে, আশা করা যায়, তাঁর স্বামী আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দাদের সান্নিধ্য লাভ করেছেন।

তাঁর পিতা, ভাই, এবং তাঁর আগের স্বামীর মত তিনিও শহীদদের কাতারে শামিল হন। অতঃপর, আরো একবার তিনি তাঁর সন্তানদের নিয়ে আল্লাহর বরকতময় পথে একা চলতে লাগলেন। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর, তুর্কিতে অবস্থানরত ভাইদের কেউ কেউ, যাঁরা পরিবারটিকে সাহায্য-সহায়তা করতেছিলেন, তাঁরা তাঁকে সেখানেই থেকে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। যাইহোক, তুর্কিসমাজে বিদ্যমান দুর্নীতি ও অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করে, অল্পদিনের মাথায় তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, পবিত্র ভূমি আশ-শামের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখবেন। তুর্কির এমন পরিবেশ ও কুফরী শাসনের অধীনে তাঁর অবস্থান ও সন্তানদের বেড়ে উঠাকে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি।

তিনি তাঁর ধর্মের ব্যাপারে এবং আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য কোন আইনের অধীনে থাকা ভূমিতে তাঁর সন্তানদের বেড়ে ওঠার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন। নিঃসন্দেহে, তিনি আল্লাহর নির্দেশিত পথেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যেমনটা রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আশ-শামে হিজরত কর, কেননা দুনিয়ার বুকে এটা হচ্ছে আল্লাহর ভূমিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ভূমি, তিনি(আল্লাহ) তাঁর সর্বোত্তম বান্দা-বান্দীদের এখানে প্রবেশ করাবেন ।" [আত-তাবারানী, আর আল-আলবানী তার সহীহ আল-জামিতে একে সহীহ বলেছেন]

"প্রত্যেক বিখ্যাত মুজাহিদের পেছনে রয়েছে একজন নারী"

ছয় সন্তানসহ আশ-শামে আগমনের পর, আমাতুল্লাহ তাঁর রবের সন্তুষ্টি অর্জনের খোঁজ করতে লাগলেন। তিনি তাঁর বড় সন্তানকে সম্মুখসারিতে জিহাদের দায়িত্ব পালনের জন্য পাঠিয়ে দিলেন, আর তার ছোট ভাই, যে তখনো জিহাদের বয়সে উপনীত হয়নি, তাকে মুজাহিদদের অধীনে ও রক্ষণাবেক্ষণে 'ইলম চর্চার জন্য পাঠালেন। দ্বিতীয়বারের মত বিধবা হওয়া সত্ত্বেও এবং স্বামীর অবর্তমানে নিজ সন্তানদের বড় করে তোলার পাশাপাশি, আল্লাহর এই সম্মানিতা বান্দী, আশ-শামে থাকাকালীন, তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় মুজাহিদদের বিধবা স্ত্রী ও এতিম সন্তানদের দেখাশোনা করে কাটিয়েছেন। অভাবগ্রস্তদের সেবা করার পাশাপাশি, প্রায় পুরো অবসর সময় ধরে তিনি শরীয়াহ শাস্ত্রের নানা বিষয় অধ্যয়ন করতেন। যেসমস্ত বোনেরা আমাতুল্লাহকে চিনতেন, তারা বলেন যে, তিনি সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল মুখে থাকতেন এবং অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করতেন।

আফগানিস্তানে থাকাকালীন তিনি মুহাজির পরিবারগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করতেন এবং তাদের খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি চাহিদা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে ঘন্টার পর ঘন্টা ঘোরাঘুরি করতেন। এছাড়াও তিনি বোনদেরকে ইসলামীপাঠ শিখাতেন, বিশেষ করে রমযান মাসে। পরিণতি যা-ই হোক না কেন, তিনি কখনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে ভয় পেতেন না, আর তিনি কুফরী শাসনের অধীনে বেইজ্জতির জীবনকে কখনোই মেনে নেননি। তাই, তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর সন্তানদেরকে উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে, 'এই বরকতময় ভূমি (আশ-শাম) কোনদিন পরিত্যাগ করো না।'

' মা হিসেবে সন্তানদের প্রতি তিনি এতটাই উদ্বিগ্ন থাকতেন যে, রাত জেগে তাদের স্কুলের কাজে সাহায্য করতেন, যাতে তাদের সর্বোত্তম শিক্ষা ও তারবিয়্যাহ (ইসলামী শিক্ষাদীক্ষা) প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়। আমাতুল্লাহ আশ-শামে দুই বছরের কিছু বেশি সময়

অতিবাহিত করেন, যতদিন না আল্লাহর হুকুমে, তাঁর শেষ যাত্রার সময় উপনীত হয়। দিনটি ছিল মুসলিমদের উৎসব 'ঈদুল-ফিতর' এর দুইদিন পর, যখন তিনি তাঁর বান্ধবীর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তখন বিমানহামলার শিকার হন। আল্লাহর এই একনিষ্ঠ বান্দী, এই হামলার ফলে, তাঁর পিতা, ভাই এবং স্বামীদের মত একই পথের অনুসারী হয়ে শহিদী কাফেলায় শামিল হন (আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন ও জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন)।

তাঁর মৃত্যুর মাসে, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর সময় ঘনিয়ে এসেছে। পবিত্র রমযান মাসের প্রত্যেকদিন তিনি এক অসুস্থ বোনের জন্য রান্না করতেন, অথচ তিনি নিজেই একটি অপারেশন থেকে সেরে ওঠার ক্রমোন্নতিতে ছিলেন, মাসের শুরু থেকেই তিনি এ নিয়ে ভুগতেছিলেন। কয়েকজন বোন বলেছেন যে, আমাতুল্লাহ শান্ত স্বভাবের ছিলেন এবং তিনি শাহাদাত সম্পর্কে প্রচুর কথা বলতেন, বলতেন যে, এটি 'নিকটেই'। একবার এক বোন তাঁকে শাহাদাত বিষয়ে এবং আল্লাহর সাথে তাঁর সাক্ষাতের ব্যাপারে অত্যাধিক কথা বলতে শুনে, তাঁকে তিরস্কার করে বললেন, 'তুমি কি সম্পর্কে এত কথা বলছ- অথচ তোমার সন্তান রয়েছে (তাদেরকে দেখাশুনা করবে কে)!?!'

আমাতুল্লাহ প্রত্যুত্তরে শান্তভাবে বললেন, 'তাদের সাথে আল্লাহ আছেন'। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাঁর রেখে যাওয়া ছয় সন্তানের মঙ্গল কামনায় ভীত হননি, কেননা তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, তাঁর সন্তানেরা যদি মায়ের স্নেহ, পরিচর্যা নাও পায়, তাদের সাথে তো আল্লাহ আছেন, যিনি সৃষ্টিজগতের সমস্ত কিছুর লালনপালন করেন। তাঁর শাহাদাত লাভের দিন, যে বোনের সাথে তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন, ঐ বোন বলেছেন, তারা বিমানহামলার সাইরেন শুনতে পেয়েছিলেন (যা আসন্ন বিমানহামলার

ইংগিত প্রদান করে), তাই সেই বোন ভেবেছিলেন যে, তাদের মেঝেতে বসে পড়া উচিত (কেননা এটা নিরাপদ ছিল)। যাইহোক, আমাতুল্লাহ জানালার পাশের একটি জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে বসে পড়েছিলেন, অতঃপর এই জানালার মধ্য দিয়ে মিসাইলের একটি টুকরো ঘরে প্রবেশ করে, যার ফলে আল্লাহর এই বান্দী তৎক্ষণাৎ এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন এবং পরকালে পাড়ি জমান।

[“এবং যাঁরা আল্লাহর পথে (জিহাদে) মৃত্যুবরণ করে, তাঁদেরকে তোমরা মৃত বলো না, বরং আল্লাহর নিকট তাঁরা জীবিত"] (আল-ইমরান:১৬৯)

এভাবে, ইসলামী ইতিহাসের আরেক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। আল্লাহর এই বান্দীর অস্তিত্ব এবং মৃত্যু, এ বিশ্বের নিকট অজানা হতে পারে - তবে মহান আল্লাহ, যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞানী, তিনি আমাতুল্লাহ আল-মাসরিয়্যাহকে বেশ ভালভাবেই জানতেন।

আমরা আল্লাহর নিকট দু'আ করি, তিনি যেন তাঁকে ও তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে শহীদদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আমিন।

“হে মু'মিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কাফের হয়েছে এবং নিজেদের ভাই-বন্ধুরা যখন কোন অভিযানে বের হয় কিংবা যুদ্ধে যায়, তখন তাঁদের সম্পর্কে বলে, 'যদি তাঁরা আমাদের সাথে থাকত তবে মারাও পড়ত না আহতও হত না।’ যাতে তারা এ ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের মনে অনুতাপ সৃষ্টি করতে পারে। অথচ আল্লাহই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। আর, তোমাদের সমস্ত কাজই, তোমরা যা কিছুই কর না কেন, আল্লাহ তার সবকিছুই দেখেন। আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর – তবে তোমরা (এ দুনিয়াতে) যা কিছু

সঞ্চয় করে থাক, আল্লাহর ক্ষমা ও করুণা ঐ সবকিছুর চাইতে অনেক বেশী উত্তম।"

(আল-ইমরান:১৫৬-১৫৭)

আপনাদের নেক দু'আয় আমাদের ভুলবেন না।